যুগান্তর

তারিখ ... 26 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া কমছে না

মুসতাক আহমদ

সমীক্ষায় বর্তমান হার ২১ ভাগ

সরকারের দৃষ্টিতে প্রধান কারণ দারিদ্র্য

বিশেষজ্ঞদের মত অতিরিক্ত ব্যয়

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া বন্ধে সরকারি উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। ৮২টি উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে দুপুরে দেয়া হচ্ছে উন্নত মানের বিস্কুট অথবা রান্না করা খাবার। এতকিছুর পরও প্রাথমিকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া কমছে না। খোদ সরকারেরই সর্বশেষ হিসাবে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রায় ২১ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। এর আগের বছরও প্রায় একই পরিমাণ শিক্ষার্থী প্রাথমিক ধাপ থেকে ঝরে গেছে। এরা লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে কাজে লেগে যাচ্ছে। আবার কেউ বাড়িতে অলস সময় কাটায়। সরকার বলছে, ঝরে পড়ার প্রধান কারণ দারিদ্র্য। দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'ভুয়া ভর্তি'। দারিদ্র্যের কারণে অনেকে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। এসব শিশুর কেউ কাজে যোগ দেয়। আবার কেউ বাবা-মায়ের সঙ্গে গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি দেয়। অপরদিকে যে সংখ্যক শিক্ষার্থীকে 'ঝরে পড়া' দেখানো হচ্ছে, তারা আসলে শিক্ষার্থীই নয়। স্কুলগুলোতে ভুয়া ভর্তি দেখানো হয়। নকল ভর্তি দেখানোয় ঝরে পড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যারা আসলেই শিক্ষার্থীই নয়। ২০১৪ সালে পরিচালিত বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি রিপোর্ট থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান এদিকে ইঙ্গিত করেই

শিক্ষার্থী : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

শিক্ষার্থী : প্রাথমিক স্তরে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলছেন, '২১ ভাগ ঝরে পড়ার যে চিত্র দেয়া হচ্ছে, তা আমাদের চিত্র নয়। অনেক স্কুল ভুয়া এনরোলমেন্ট (ভর্তি) দেখায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব শিক্ষার্থী আর দেখাতে পারে না তারা। আসলে বেশি বেশি নতুন বই এবং বিস্কুট পাওয়ার জন্য হয়তো নকল ভর্তি দেখানো হতে পারে। তবে এ ধরনের কাজ বন্ধের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। প্রকৃত চিত্র বের করা হবে। মাত্র ৬ মাস সময় লাগবে। আসল তথ্য পাওয়ার পর আমরা তা জাতির সামনে তুলে ধরব। এখানে লুকোচুরির কিছু নেই।' মন্ত্রী বলেন, আমরা শতভাগ শিশুকে উপবৃত্তি দেয়ার চেষ্টা করব। অর্থের পরিমাণ হয়তো এখন বাড়ানো যাবে না। কিন্তু ১০০ টাকা করে হলেও সবাইকে উপবৃত্তি দেব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, নানা কারণে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ছে। এর মধ্যে আর্থিক, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণ অন্যতম। এছাড়া ফেল করে, দ্বিতীয়বার পরীক্ষা না দেয়াও একটি কারণ। তিনি বলেন, জেলাভিত্তিক ড্রপ-আউটের দিকে তাকালে এর আঞ্চলিক কারণ জানা যাবে। সবচেয়ে বেশি ড্রপ-আউট হয় গাইবান্ধায়। জেলাটি দারিদ্র্যপীড়িত এবং নদীভাঙনপ্রবণ এলাকা। ভোলা ড্রপ-আউটের দিক থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জেলা। তবে সরকারি এই ভাষ্যের সঙ্গে একমত নন প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন এনজিওর সবচেয়ে বড় মোর্চা গণসাক্ষরতা অভিযান। এই সংস্থার নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যুগান্তরকে বলেন, বর্তমানে ঝরে পড়ার প্রধান কারণ দারিদ্র্য নয়। বর্তমানে শিক্ষায় অতিমাত্রায় ব্যয় এর প্রধান কারণ। দরিদ্র ব্যক্তিও চান তার সন্তান লেখাপড়া করুক। এজন্যই তিনি শিশুকে নিয়ে স্কুলে আসছেন। নাম লেখান। কিন্তু লেখাপড়া নিয়ে যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে, তাতে টিকতে না পেরে অনেকেই ঝরে যাচ্ছে। তিনি বলেন, অসুস্থ প্রতিযোগিতাটা শুরু হয়েছে স্কুলের ভেতরে। নোট-গাইড আর প্রাইভেট-কোচিংয়ের দৌরাত্ম্য চলছে। এটা কম আয়ের মানুষের পক্ষে সামাল দেয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, যেসব এলাকায় ড্রপ-আউট বেশি, সেসব এলাকা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে। এ ধরনের এলাকায় দারিদ্র্যই যদি ড্রপআউটের কারণ হয়, তবে সেখানে 'এনরোলমেন্ট' (ভর্তি) কম হওয়ার কথা। কিন্তু তা নয়। বাবা-মা সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করান। এরপর যখন ব্যয়ের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেন না, তখনই সন্তান স্কুল থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার চালচিত্র বের করতে প্রতি বছর সরকার দেশব্যাপী একাধিক সমীক্ষা চালায়। এর একটি হচ্ছে 'বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি'। এবার ২০১৪ সালের বিভিন্ন তথ্যের ওপর এই শুমারি পরিচালিত হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শুমারির প্রতিবেদন সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়। এই প্রতিবেদনে বলা হয়, শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার ঘটনা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির পরই শুরু হয়। তবে চতুর্থ শ্রেণীতে গিয়ে তা প্রকট আকার ধারণ করে। এমনকি পঞ্চম শ্রেণীতে ওঠার পরও সমাপনী পরীক্ষা না দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে সমাপনী পরীক্ষা পাসের পর কতজন ঝরে পড়ে বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয় না, সে তথ্য অবশ্য পাওয়া যায়নি। এই সংখ্যাও কম নয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এতে আরও বলা হয়েছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সব শিক্ষার্থী নিয়মিত ক্লাস করে না। সারা দেশে দৈনিক গড়ে সাড়ে ১৩ ভাগ শিক্ষার্থী স্কুল ফাঁকি দেয়। সমীক্ষা বলছে, এরই প্রভাব পড়ছে স্কুলের অভ্যন্তরীণ বার্ষিক পাস এবং 'রিপিটেশন'র (নতুন ক্লাসে পদোন্নতি না পেয়ে একই ক্লাসে থাকা) হারের ওপর। এমনকি সমাপনী পরীক্ষা পাসের ওপরও এর প্রভাব পড়ছে। সমীক্ষা অনুযায়ী, সারা দেশে প্রায় সাড়ে ৬ ভাগ শিক্ষার্থী 'রিপিটেশন' করে। এসব শিক্ষার্থী একটি বছর লেখাপড়া করার পরও পাস করতে পারে না। ফলে তারা নতুন ক্লাসে উঠতে পারে না। অপরদিকে নতুন ক্লাসে ওঠার মতো নম্বর পায় আরও কম শিক্ষার্থী। এই শিক্ষার্থীর হার মাত্র ৮১ শতাংশ। সরকারি ভাষায়, এসব শিক্ষার্থীকে বলা হয় 'সারভাইভাল' শিক্ষার্থী। আর সমাপনী পরীক্ষায় ২০১৪ সালে পাস করেছে ৯৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ শিক্ষার্থী, যা আগের বছরের তুলনায় কম। আগের বছর সমাপনীতে পাসের হার ছিল ৯৮ দশমিক ৫০ শতাংশ।

শ্রেণীভিত্তিক ঝরে পড়ার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালে প্রাথমিকে মোট শিক্ষার্থী ছিল ১ কোটি ৯৫ লাখ ৫২ হাজার ৯৭৯ জন। এই সংখ্যা অবশ্য ২০১৩ সালের চেয়ে, প্রায় ৩২ হাজার কম। মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীতেই ঝরে পড়ে ১ দশমিক ২ ভাগ। এদের মধ্যে ছেলেশিশু বেশি, ২ শতাংশ। মেয়েশিশু মাত্র দশমিক ৪ ভাগ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঝরে পড়ে ৪ দশমিক ৬ ভাগ। এই স্তরে অবশ্য ঝরে পড়া শিশুর মধ্যে মেয়েশিশুর হার বেশি, ৫ দশমিক ৭ ভাগ। এভাবে তৃতীয় শ্রেণীতে ৪ দশমিক ৮ ভাগ, চতুর্থ শ্রেণীতে ৮ দশমিক ১ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। আর পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেও ঝরে পড়ছে ২ দশমিক ৩ ভাগ শিক্ষার্থী।

জেলাভিত্তিক ঝরে পড়ার চিত্রও এতে বেরিয়ে এসেছে। ৬৪ জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে গাইবান্ধা জেলায়। ওই জেলায় ঝরে পড়ার হার প্রায় ৪৩ ভাগ। এছাড়া ভোলায় ৪০ দশমিক ৪ ভাগ, কিশোরগঞ্জে ৩৮ দশমিক ১ ভাগ, নেত্রকোনায় ৩৯ ভাগ ঝরে পড়ছে। সিলেট অঞ্চলে সেই হিসাবে কম। এই বিভাগে সবচেয়ে বেশি ঝরে পড়ছে সুনামগঞ্জে, ২৯ দশমিক ৬ ভাগ। সবচেয়ে কম ঝরে পড়ে মৌলভীবাজারে ১৭ দশমিক ২ ভাগ।

সেই বিবেচনায় তিন পার্বত্য জেলার ঝরে পড়ার হারও তুলনামূলক কম। বান্দরবানে এই হার ২৯ দশমিক ১ ভাগ। এছাড়া খাগড়াছড়িতে ২২ দশমিক ৬ ভাগ আর রাঙ্গামাটিতে ২১ দশমিক ৮ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে।

২০১৩ সালেও এই একই ধরনের শুমারি করেছে সরকার। এক বছর আগের ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী সারভাইভালের হার ৮০ দশমিক ৫০ ভাগ। ঝরে পড়ার হার ২১ দশমিক ৪ ভাগ। স্কুলে নিয়মিত শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার ৮৬ দশমিক ৩ ভাগ। আর রিপিটেশনের হার ৬ দশমিক ৯ ভাগ।

গণসাক্ষরতা অভিযানের উপপরিচালক কেএম এনামুল হক বলেন, ঝরে পড়া রোধে সরকার বর্তমানে স্কুলে শিশুদের উন্নত প্রোটিনসমৃদ্ধ বিস্কুট দিচ্ছে। কিন্তু এটি পরিচালিত হচ্ছে মাত্র ৮০টি উপজেলায়। আবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) চিহ্নিত দারিদ্র্য ম্যাপ অনুযায়ী স্কুলে উপবৃত্তি দিচ্ছে। এটা মাত্র ৪০ ভাগ শিশুকে কাভার করছে। একদিকে সব শিশু এই উপবৃত্তি পায় না। অপরদিকে ২০০৩ সালে যে অর্থ দিয়ে এই কর্মসূচি শুরু করা হয়েছিল, এখনও তাই রয়েছে। এই নীতি এখন আর চলবে না। তিনি বলেন, ২০০৩ সালে প্রতি শিশুকে ১০০ টাকা আর এক পরিবারের দুই সন্তান থাকলে ১২৫ টাকা করে উপবৃত্তি দেয়া শুরু হয়। একই পরিমাণ অর্থ এখনও দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এই ১২ বছরে যে পরিমাণ মূল্যস্ফীতি ঘটেছে, তাতে এই অর্থের মূল্যমান এখন ৫০ টাকায় নেমে এসেছে। এ ধরনের কৌশল দিয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন হবে না। অবশ্যই উপবৃত্তির পরিসর এবং পরিমাণ দুটিই বাড়াতে হবে।